সেই আয়না

জয়ঢাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি-

সুজয় রায়

সেই আয়না

সুজয় রায়

জয়ঢাক-পড়ুয়াদের জন্য এবারে কলম ধরলেন শিল্পী সুজয় রায়, তুলির সাথে কলমেও শব্দছবি আঁকায় যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য জাদু আয়না, যার বুকে ধরা পড়েছে পুরোনদিনের সব ছবি, বিহারের গ্রামদেশে কাটিয়ে আসা এক সুন্দর ছোটবেলার গল্পকথা। এসো, আমরা সবাই মিলে দেখতে বসি--

অলংকরণ: মৌসুমি
একটি জয়ঢাক ই-পুস্তক প্রয়াস
যোগাযোগ: joydhak@gmail.com

এক

সেই আয়না, সেই কাল, সেই বায়না। অতীতকে ফিরে দেখা। এইতো সেদিন ছিল, আজ নেই। অশ্বক্ষুরের ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেল। আমার আনাড়ি শৈশব উঁকি মারছে আয়নাতে। খোলা আকাশটা আয়নার বুকে ছায়া ফেলেছে, অতীতের পুরাতন মেঘটাকে টেনে খেয়া পারাপার করছে আজও। স্মৃতির রঙ বুঝি নীলাকাশ? সেই আয়না, মায়ের বিয়ের উপহার।

সেই আয়না, যাতে শৈশব ধরা থাকে। বিহারের পল্লী জীবনের মস্ত অবকাশ, যেখানে কাল বহে যায়, কিন্তু ইতিহাসের চাকা এক কদম এগোয়, দুই কদম পিছিয়ে আসে। বাড়ির খাস দেহাতী চাকর রোজ সকালে তেঁতুল দিয়ে পিতলের লোটাটা ঘষে চকচক করে চকমিলানো রম্যপ্রাসাদ গড়ে তুলছে যেন। কেবল লোটা-কম্বল ছিল যার জীবনের

সম্বল। আমিও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রুমালের ঘষা টানে স্মৃতির সৌধ আঁকি সেই আয়নাতে।

আবার মুছি সেই আয়না। যৌথ পরিবারের মিছিল। তারই মধ্যে তারা-খসা আমি - ঘরছুট, দলছুট হয়ে এক লম্বা দৌড় দিচ্ছে আমার তরুণ পা দুটি। পলাতকা ঘুড়ির মত সঞ্চারী হৃদয়। মানুষ-সমান কাশবন চৌচির করে ছুটে চলেছি আমি। সর-সর আওয়াজে কাশবন বিদীর্ণ করে ছুটে চলা। নীল আকাশে সাদা কাশ আমার মুগ্ধ প্রাণে মোচড় দিয়ে যাচ্ছে। একটা গঙ্গাফড়িং জুটেছে মানুষের সঙ্গে। আকাশের গায়ে টেলিগ্রাফের তার টানটান করে বাঁধা। সুদূরের খবর, ঐ তারে বাজছে। একটা তীক্ষ্ণ শীষের সুর সেই তারে বেজে চলেছে। আমার বুক হাপরের মতো ওঠা নামা করছে। কোনদিন সেয়ানা ছিলাম না আমি। কিন্তু জেঠিমা দু'খিলি পান মুখে পুরে বলতেন, 'ছেলেটা শেয়ালপক্ক, ওর হায়নার হাসি, আর কুমভীরাশ্রু'। হুট করে কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় পায়ের চাকা এবারে টপ গিয়ারে ছুটে চলল। অভিমানে কাশবন উদাস

হয়ে আছে। এবার রাস্তা ঘুরে চলল আমের বাগিচায়। বাতাসের আঙুলে গাছের মাথায় পাতার বিনুনির বিন্যাস।

ল্যাংড়া, ফজলি, বোম্বাই, সিঁদুরে, কলমের আম, আঁটির আম--বাগানের এই ভরা সংসার।বাগিচার পশ্চিমপ্রান্তে সারি বেঁধে প্রহরায় দাঁড়িয়ে লম্বা গাছগুলি--তুঁতে ফল হয় তাতে। সবুজ লাল রঙ মেশানো। আস্বাদের প্রশ্রয় দিতে জানে সেই ফল। বাগানের দক্ষিণ সীমানায় বাতাবি, গন্ধরাজ আর লিচু গাছ। আমের ঘরে উপরি পাওনা এরা।

জ্যৈষ্ঠমাসের তপ্ত হাওয়া হাহাকার স্বরে বাগানের বুক বিদীর্ণ করে উড়ে চলে। কালবৈশাখী ঝড়ের পূর্বাভাষ গাঙের মাঝি আগাম খবর পেয়ে আমাদের কাছারিতে জানায়। ঋতু পরিবর্তনের আগমনী বার্তা - আবহাওয়া দপ্তর নয়, অন্য নিয়মে চিঠি লিখে পাঠায় গ্রামের মানুষকে। বিহারে এক বছর খরা যায়, পরের বছর বন্যা। ‘বন্যার জলের ঢল নামবে এবার, বাবু, শক্ত করে বৈঠা ধরে বসো।’ একদিলে করালী গঙ্গা পাড় ভাঙছে, অপর প্রান্তে তিস্তার ভাঙন। দুই নদীর সাঁড়াশি আক্রমণ।

ভাঙনের পারে বিহারের মানুষ উদ্বাস্তু জীবন ধারণ করে রয়েছে। আমার গ্রামে আজও লণ্ঠন সভ্যতা। ‘হেই বাবু, তোমার গ্রাম কোথা?’--------- ‘ঐ যেদিকে চিল উড়ে চলেছে উধাও দিগন্তে, সেখানে আমার বাল্যের বৃন্দাবন।’

পিচের রাস্তা ধ্বংস হয়েছে, রেললাইন গেছে গঙ্গার পাকস্থলীতে। সেখানে আমার গ্রাম, অ্যাট দ্য ব্যাক অফ দ্য বিয়ন্ড।

--------সময়ের পাতা ঝরে যায়।

দুই

ঠাকুরদা হেমচন্দ্রের কথা হচ্ছিল। কলম বাগালেই মানুষটিকে মনে পড়ে বাগিচার আশ্চর্য মালি চরিত্রে। সময় ও অর্থের ছিল না অভাব। হাতে নয়, কিন্তু প্রাণে ধরেছিলেন বনস্পতিকে। রবি ঠাকুরের দিকে নির্ভর বিশ্বাস কম ছিল তাঁর। জমিদারীর শান দেওয়া বুদ্ধি দিয়ে কবিকে স্থান দেননি জীবনদর্শনে। মেজাজটা ছিল বঙ্কিমী। ঠাকুরদাকে আইনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে মোকদ্দমা চালাতে হতো।

বাড়ির পশ্চিমদিকে বিশাল কাঁঠাল গাছ বাড়িটাকে ছত্রছায়ায় ঢেকে রেখেছে। কাঁঠাল তলায় গেলেই অনেকের মাথায় সেই গাছ কাঁঠাল ভাঙছে। বাড়ির আধমাইল দূরে গাছের আগ্রাসী শিকড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পশ্চিম বাগানে ডালিম গাছ, যার ফুল ঠাকুরদার দিবাস্বপ্নে রঙীন ফাগ মেশাচ্ছে। আর বাতের শরীরে মলম বুলিয়ে দিচ্ছে। সারি সারি ফলন্ত পেঁপে গাছ। পেঁপের গায়ে ক্যালশিয়ামের সুঁই দেওয়া হতো। হেমচন্দ্রের ফটো আছে পেঁপে গাছের সামনে। ফোলা ফোলা চেহারা, তাকিয়ার মতো শরীর। বাড়ির পূর্বদিকে আমার তরুণ পা ছুটে চলে। সেখানে পেয়ারা গাছ - বড় বেয়ারা তার বেড়ে ওঠা। সেখানে আছে গোলাপ গাছের কেয়ারি। সেখানে উঁচু করে সিমেন্টের গোল বেদি তৈরি হল। পাঁচ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। মা সবে নববধূ হয়ে এসেছেন শ্বশুরবাড়িতে। সকলে নাম রাখল নতুন কাকিমা। সেই নাম পরিবারে অক্ষয় হয়ে রইল। আজ কোজাগরি পূর্ণিমার শতদল ঢল নেমেছে। মা বেদিতে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছেন,

‘অয়ি বৃন্দাবনে লীলা অভিরাম ছবি, আজও পড়ে মনে মোর--------।’ ঠাকুর্দা গড়গড়ায় ভুড়ুক ভুড়ুক ভড়ং করছেন।

উত্তরদিকে বাড়িটা পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে দিনের অন্তিম আলোয় রজনীগন্ধা, হাসনুহানা, কেয়া আর ম্যাগনোলিয়া ফুল। একটা আশ্চর্য সুন্দর ফুলের উদদাম সৌরভ সারা সংসারকে বৈকুন্ঠের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে স্বপ্নের মসনদে বসিয়ে। চোখের পরে ঘুমের কাড়াকাড়ি শুরু হওয়ার আগে এইচ-এম-ভি কোমপানির কলের গান সারা সন্ধ্যা শোনা যাচ্ছিল। - ‘নীল যমুনার তীরে, রাধা কাঁদার সুরে----------,’ কিংবা সিরাজদদৌলা পালার রেকর্ডে বাজছিল সিরাজের পলাশীর যুদ্ধে যাওয়ার আগে বিলাপ, ‘আলেয়া, আর যদি না ফিরি?’ সকলের মনের মেজাজটা ছিল প্যাট্রিয়টিক।

আমি সেদিনের সন্ধ্যায় লন্ঠন জ্বালিয়ে ইতিহাসের গলিতে হাতড়ে বেড়িয়েছি। অবন ঠাকুরের ’রাজকাহিনি’ পড়ে কান্নার জলে চোখ ফুলে উঠল।

তিন

সেও এক রাত ছিল! মা ও বাবার কোল কাড়াকাড়ি করে শুয়ে আছি। বাবার নাসিকা গর্জন অসীম আশা আকাঙ্খা নিয়ে সা, রে, গা, মা ভাঁজছে। মা সারাদিন পরিশ্রম করে আমার বুকে হাত রেখে ইষ্টনাম জপ করতে করতে ঘুমে কাদা হয়ে পড়েছেন। আমার চোখে ঘুম ফাঁকি দিয়েছে। টিনের চালে পায়রার নখের আওয়াজ তীক্ষ্ণ স্কেলে কানে বাজছে। ঘরের ঘুলঘুলিতে ওরা বাসা বাঁধে। একবার ডান, একবার বাঁ পায়ে দাঁড়াচ্ছে। ঝিঁঝি পোকা, বাতাসে শেয়ালের ডাক, শ্যাওড়া গাছের পেত্নীর সাদা শাড়ি।

বাবার গায়ে পা তুলে দিয়ে কোলবালিশ করে বাঁদরছানার মতো কুতকুতে চোখে তাকিয়ে আছি জানলার দিকে। বুকের ভেতরে বিপদের ঝাঁপতাল বাজছে। এমন সময় বাড়ির উত্তরদিক থেকে এক চোখ ধাঁধানো আলো খোলা তরবারির মতো ঘরে এসে পড়ল। তার রুষ্ট ভয়াল শিখা এ ঘর, সে ঘর, সারা বাড়ি ছোটাছুটি করছে। সারা বাড়ি জেগে

উঠে সরগরম হয়েছে। প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে বল্লম থাকত। বাড়ির সেপাই আর লেঠেলরা হাঁক ডাক শুরু করল। কলের গান আবার সবাক হয়ে উঠল - যাতে কেউ ঘুমিয়ে না পড়ে। উত্তরের মাঠে ভিন গাঁয়ের ডাকাতরা এসেছে। শিকারের টর্চ (চার ফুট সমান লম্বা) জেলে দেখছে গৃহস্থ জেগে আছে কিনা। নইলে কচুকাটা করে রেখে যাবে সকলকে।

ভোরের দিকে বিপদের কালো মেঘ পিছু হটে সরে গেল। রেখে গেল গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে এক অশনি সংকেত।

ভয়ের রাত কেটে গিয়ে পরের দিন সকালবেলার মুখটা কত নির্ভয়। মালি এসে সাজি ভরে তাজা গোলাপের তোড়া রেখে গেল বড়কর্তার শোয়ার ঘরে। ভোরের স্তিমিত আমেজ, আর স্বচ্ছন্দ বাতাস। বাবা এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে নিমের দাঁতন শুরু করেছেন। ওনার দাঁতগুলি ডালিমের দানার মতো। হঠাৎ কানে এল একতলায় হারমোনিয়াম বাজিয়ে দশটি গলা হরিসংকীর্তন শুরু করেছে। সমস্বরে ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু

কাকস্য পরিবেদনা! বাড়ির লোকেরা ঘোরাঘুরি করছে বটে, তবে ফিরেও তাকাচ্ছে না। বাবা এসে বললেন, ‘‘ওরা কে জানিস? আমাদের গ্রামের ডাকাতদল। গ্রামে পুলিশ এলে আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। চর এসে খবর দেবে টিকটিকি সরে গেছে, তখন এরাও ফিরে যাবে।’’

জিজ্ঞাসা করলাম ,‘‘কেন?’’

‘‘জমিদারের বাড়িতে পুলিশ ঘেঁষে না সচরাচর।’’

‘‘কেন?’’

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘‘কেন, কেন, কেন--- রেকারিং ডেসিমেল চালিয়ে যাচ্ছ! এত প্রশ্ন করা বড্ড খারাপ স্বভাব। ওদের সঙ্গে শলা হয়েছে, অন্য গাঁয়ের ডাকাত পড়লে এরা আমাদের রক্ষা করবে। এরা আমাদের বন্ধু।’’

শুনে শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল আমার। রাতে দস্যু, দিনে ডাকাত, বাবা কাকারা ডাকাতের স্যাঙাত, তবু তো কয়েক পুরুষ সময় কেটে গেল, গায়ে আঁচড়টি লাগেনি।

চার

কলম ও সেই আয়না। অতীতের সঙ্গে সেতুবন্ধন করে চলেছে। কাছারি ঘরে ঝুলানো কবেকার ঘরজোড়া টানা পাখা আজ আবার দুলে উঠল। আজ হেমবাবু এজলাসে বসবেন। কাছারি বারান্দায় প্রজারা তক্তপোশে বসে গামছা দিয়ে ঘাম মোছে আর গায়ে বাতাস করে। সামনে সবুজ চওড়া মাঠ, বেড়া দেওয়া গাছের সারি চারধার ঘিরে আছে। আরো লোক আসছে গরুগাড়ি চড়ে, পায়ে পায়ে, লাঠি হাতে। কারো গামছায় মুড়ি, চিঁড়ে বাঁধা, বিলম্বের ক্ষুধা মেটাতে হবে। একটা ছোটখাটো জনারণ্য। বাড়ির সামনে সদর রাস্তায় দুই ধারে ইউক্যালিপ্টাস গাছ। এক মাপা গোছানো পারিপাট্যের ছাপ চোখে পড়ে। সেটা যত্নের পারিপাট্যর জন্যই হোক, অথবা জমিদারীর স্বাচ্ছন্দ্যের দরুণ। কালটা ছিল অনেক আগে, আমার কৈশোরের গোড়ার ছবি। আমার হাঁটা তখন ছিল বাঁকা, পায়ের দুই পাতা বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকত। পদ-স্খলনই ছিল শৈশবের চলার ছন্দ। বুদ্ধি ছিল ঝাপসা, কিন্তু নবীন শরীরে স্নায়ু ছিল সতেজ। অবাক বিস্ময়ে পৃথিবীর

আলো পান করতাম। আজও সেদিনের পায়ের ছাপ ঘাসের বুকে দেখতে পাই। কাছারি ভর্তি লোক। খাজনা, নালিশ, মামলা, মোকদ্দমা, দশ ঘা বেত। পাইক, বরকন্দাজ, দলিল, দস্তাবেজ, ক্ষেতী, পালা, পার্বণ, দেনাপাওনা, আদব, বেয়াদব, বেওকুফ, খাজনা, মকুব-----, ইত্যাদি কত কী ভারি ওজনের আক্কেল গুড়ুম কথাবার্তা, শব্দের গোলাবর্ষণ হল তার হিসেব সেদিনের বালকের কাছে চেও না। আমি শুধু সেই ঘরে আড়ি পাতি। আর ঠাকুরদার আরামকেদারায় বসে সঙ সাজার ছবিই আঁকি মনে।

এজলাস ভাঙল। প্রজারা দু:খে-সুখে কান্না ও হাসির সঞ্চয় নিয়ে গেল ফিরে। কাছারি ঘরটা এবার বিদায়ী দিনের পতিত ভূমি। এজলাস ভাঙলে বসতে গেলাম ঐ সিংহাসনে। কিন্তু হায় আমার আগে বাবা দখল করেছেন সেই আসন। বাবার ক্যাপস্টেইন তামাকের কৌটো টেবিলে রাখা। দৃশ্যের পালাবদল হল। বাবার এজলাস শুরু হয়েছে অন্য চরিত্রের। হাটে বাজারের সন্ধানী মীমাংসা সেখানে ঠাঁই পায়না। খেলার মাঠ সেই বৈঠকের মর্মস্থল। সবুজ অবুঝ মন পায়ের নিশানায়

গোলাকার বলকে গোলকধামে পাঠিয়ে হাততালি কুড়িয়ে নিতে চায়। ফুটবলের গুলতানী আর চায়ের জন্য চাকরের পেছনে হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। কিষণপুরের ফুটবল টিম বাবাকে ঘিরে আছে। বাবার পেটানো শরীরের গঠন, প্রকৃতির হাতে যত্নে গড়া খেলোয়াড়ি ভাঁজ। খেলা জেতার আলো চোখে মুখে। ক্যাপস্টেন সিগারেট ঠোঁটে ধরে একটা কাপ্তানী ভঙ্গী। ঠোঁট আর হাতের চেটো আশ্চর্য লাল, যেন আবীর মেশানো। উঠতি খেলোয়াড়রা তাঁকে নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো ঘিরে রয়েছে। ওনার গোঁফ তীক্ষ্ণ করে সযত্নে কামানো, থিয়েটারি টান-টোন আছে।

ক্রমে ক্রমে দিনের পিঠ সূর্যাস্তের আড়ালে গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু কাছারি ঘরের ছুটির অবসর নেই। অন্য জনতা চওড়া তক্তপোশে ভিড় জমাল এবার। গ্রামের থিয়েটারের দল। এরা মাঠের কঠিন কাজে ব্যথা পায়। কিন্তু রসের আসরে নরম জমিতে শোভা পায়। মাথায় বাবড়ি, নয়নে চোরা চাহনি। কাছারির দেয়ালে চিতা বাঘের ছাল জুড়ে আছে, মুখের দাঁত বার করা। চোখদুটি জ্বলছে। গ্রামের

পালাপার্বণের মাস আসছে, থিয়েটারের ঢাক গুড়গুড় কানে বাজছে। বাবা আবার মধ্যমণি।

কিষণপুর গ্রাম থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে বংশের আদি বাড়ি ডিল্লি দেওয়ানগঞ্জে। ফুলবর নদীর পাড়ে উঁচু জমিতে ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভুবনচন্দ্র রায়ের কালে তৈরি হয়েছিল তা। আমাকে নিয়ে পাঁচপুরুষ কেটেছে সেই গাঁয়ের আসমানের তলায়। রাধাকৃষ্ণের কূলবিগ্রহ সেখানে আজও পূজা পায়। অতীত সেখানে ঈশ্বরের দিকে ঊর্ধ্বে হাত বাড়িয়ে কৃপা ভিক্ষা করছে।

কিষণপুরে ঠাকুরদার নামের বাড়ি ‘হেমকুঞ্জ’। সেখানে দাঁড়িয়ে উত্তরমুখে দৃষ্টির ডানা মেলে দাও দিগন্তের খোলা জানালায়। মনের কল্পনা বলগাহীন হয়ে ছুটে চলবে। দূরে কুমেদপুর স্টেশন। ট্রেনের ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে নীল আকাশে ছবি আঁকছে। অত দূরে দৃষ্টি মেললে মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করে ওঠে। স্টেশনে আনাচে কানাচে আছে ডিল্লি দেওয়ানগঞ্জ। পথের মাঝখানে জমিদারীর কামাথ অর্থাৎ ফার্ম হাউস। উধাও দিগন্তের মাঝখানে সোনালি ফসল। ধান, পাট ,

কলাই , ভুট্টা, আখ তুলে গোলায় ভর্তি করা হয়। কামাথের কথা কানে এলে ছুটির ঘন্টা প্রাণে বাজত। তাল, তমাল বনরাজি যেখানে নীল দিগন্তে গিয়ে মিশেছে সেখানে আলোছায়ার খেলা, মেঘের মেলা, বাতাসের করতালি। সেখানে ছিল ভাঙা পথের রাঙা মাটিতে আমার ধূলার সিংহাসন। উধাও দিগন্তের তলায় চোখ বেঁধে প্রকৃতির রহস্যের সঙ্গে কানামাছি খেলা। আকাশে শ্রাবণের স্বরবিতান আমার কানে মন্ত্র পড়ছে। পুঞ্জ মেঘের পাহাড় জমেছে মুক্তাঙ্গণে।

জীবনের সিঁড়ি বেয়ে অবতরণ। সেই আয়নার সামনে দাঁড়ালে কানে বাজে সময়ের ভোঁ দৌড়। আয়নার ছায়াকে কলমের মসী দিয়ে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি গড়ি।

কলমের কোলাহল থেমে গেলে বাড়িটা আজকাল একলা খাঁ খাঁ করে। দ্বিতল বাড়ির সবক'টা ঘর খালি। নিস্তবধতা থই থই করে। যে ঘরে বাল্যজীবনটা বিছানায় কুন্ডলী পাকিয়ে ভোরের আশায় এক চিলতে আলোর প্রতীক্ষা করত, সেখানে আলসে দিনগুলি অনবসরের উজান ঠেলে আর

ফিরে আসে না। ঠাকুর ঘরটা অলীক অন্ধকার ঠেকে, যেখানে একসময় সংসারটা কতই না মাথা ঠুকেছে। ফসলের গোলা শূন্য। মানুষেরা নেই। তবুও কলমের হাওয়ায় ফানুস ওড়াচ্ছি শূন্য বন্ধ্যা অতীতে। মানুষের পথিক ইতিহাস। কলমের ছুটি নেই। লিখি কেন? নিজেকে ভোলাবার জন্য। কলম স্ত হলে অতীতের বুকফাটা হাহাকার কানে আসবে, ‘‘নেই, নেই, নেই!’’ ণত্ব ষত্ব ভুলে কেঁদে উঠবে, ‘‘বাবা’’!

যতদিন লেখা দিয়ে অক্ষরের কালো শরীরে জীবনের ভাস্কর্য খোদাই করে চলা যায়, ততদিন আরব্য রজনীর পিদিম হেমবাবুর দ্বিতল বাড়িতে বহু কক্ষে ঝলমল করবে। পালে হাওয়া নেই, তবুও অতি কষ্টে কলমের বৈঠা বেয়ে চলা।

পাঁচ

বাড়িতে বিয়ে লাগলে গ্রাম উজাড় করে খাওয়ার পাত পড়ত। ভিয়েন বসত বাড়ির বাগানের গায়ে। বাড়ির ভেতরেও উৎসবের জন্য ছিল তিনটে আলাদা রান্নাঘর। ধানের ক্ষেতের লালচে রঙের মোটা চাল মোটা বসনের মতো আমজনতাকে

মুষ্টিখোলা আনন্দ দিত। গ্রামের প্রজারা, চাষীরা বসেছে সারি সারি। কয়েক মাস আগে থেকেই খাওয়ার গন্ধ গ্রামের আকাশে। বাতাসে নাক পাতছিল সবাই, গ্রামে একটা বিয়ে লাগতে যাচ্ছে।

‘‘পরাণের ভেতরটা হাঁচোর পাঁচোর করত্যাছিল কর্তা’’, এক মুসলমান প্রজা শুনিয়ে দিল। সোনা মুগের দাল, ভাজা, রুই, কাতলা, খাট্টা খোট্টাই দই, মুড়কি। মিষ্টির নাম খাজা, যেটা পাতে দিলেই পিঁপড়েরা হত্যা দেয়! ছোট পিসেমশায় বাঘের মতো ভাঁড়ার আগলে বসে আছেন। রোজ সকালে চব্বিশটা ডিমসেদ্ধ খেয়ে প্রথম কথা বলেন, ‘‘জীবনটা গোল্লায় গেল’’। আমরা পঙ্গপাল ভাইয়েরা পরিবেশন করছি। পিসেমশায় কোড ল্যাঙ্গোয়েজ-এ নির্দেশ দিচ্ছেন, ‘‘টিপে টিপে দাও,’’ অর্থাৎ ভাঁড়ারে উদ্বৃত্ত আছে, নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। সকলে আবেদন করছে, হাতা, খুন্তি ফেলে দিন, খাবারের হাঁড়ি, কলসি, ঝুড়ি যা আছে পাশে রেখে যান, কষ্ট দেব না বাবুদের। পিসেমশাইয়ের হুকুম শোনা গেল, ‘‘খাবার রিপিট করো, ডিফিট হয়ো না,’’ অর্থাৎ কিনা সমঝে চলো, একটু

সযত্নে হাতটান করো। শেষবারে তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, ‘‘ওরে তোরা ঢেলে ঢেলে দে!’’ অর্থাৎ কিনা ভাঁড়ার শূন্য। অতিথিরা ততক্ষণে গলাভর্তি খেয়ে বিশাল জালার মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। এক খাওয়াতেই বাজিমাত।

সেই আয়নার গায়ে ট্রেনের ধোঁয়া ভেসে উঠল কেন? ও হরি, বরযাত্রী আসছে কলকাতা থেকে। আশায় মালা জপ করতে করতে। জ্যাঠতুতো বোনের বিয়ে। ঠাকুর্দা চিঠির পাতায় হিসেবি বুদ্ধি মিশিয়ে বংশানুক্রমিক বাঁশবনের রাজত্বটাকে মুখরোচক করে তুলে দিয়েছেন বকুলবাগানে বোনের ভাবী শ্বশুরকুলের হাতে। সেখানে তারা ভাবছে, ‘‘আহা, কি কুলমর্যাদা! কখনো চাকরি করে গতর নষ্ট করে না। বাড়ির খায়, দিন দুপুরে তোফা নিদ্রা যায়। সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।’’ আশা ভরা একটা লম্বা দম বুকে টেনে বরযাত্রীর দল শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেনে চেপে রওনা দিল। রাত ভোর হলে ট্রেন এসে পড়বে তিন পাহাড়ের মাথার ছায়ায়। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে সাহেবগঞ্জ জংশন। সেখান থেকে বালিতে পা ডুবিয়ে যাওয়া গঙ্গা স্টিমার ঘাটে। আগের দিন

আকাশ ফুঁড়ে পানি এল, তাই বালিতে কাদাতে পায়ের তলায় তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। হাত দিয়ে পা টেনে তুলে নিয়ে কাদার কাছ থেকে দখলদারি নিতে হচ্ছে। কুলি মালের বহর দশভূজা হয়ে তুলে নিয়ে বোঝাই বজরার মতো কাদার বাঁধন ছিন্ন করে ছুটে চলেছে স্টিমারে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। স্টিমারে জায়গার সংকুলান বড় কম। ভোর সকালে এমন কর্মব্যাস্ততার জন্য মনটা প্রস্তুত নয়। এদিকে কাদার সঙ্গে নিজের লড়াই, ওদিকে কুলিসর্দার যাত্রীর জনতাকে ছেড়ে দলছুট হয়ে হারিয়ে গেল। জান রাখি, না মাল রাখি? ওদিকে মান সম্মান জলাঞ্জলি। কার গৃহিণী কার কর্তার কাছার খুঁট ধরে ''ওগো শুনছো, ওগো শুনছো'' ডাকে অরণ্যে রোদন করছে তার হিসেব করার সময় কোথায়? কর্তা বিহারী কুলির টিকি লক্ষ্য করে একই জায়গায় কাদায় দাঁড়িয়ে ছোটাছুটির মোটামুটি স্লো মোশান নাটক করে চলেছেন। পার্কস্ট্রিট মার্কা এক সুবেশা মহিলা চলেছেন দার্জিলিঙে। কিন্তু কাদার পায়েসে মাছির মতো লটকে আছেন। এত ক্লেশ কেন? কারণ এপারে বাংলা,

ওপারে বিহার, মধ্যিখানে গঙ্গা। এপারে যেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কর্মব্যাস্ততা চলেছে।

আমাদের বরযাত্রীরা উথালি পাথালি করে স্টিমারে এসে স্বস্তির নি:শ্বাস ছাড়ল। স্টিমারের সারেং খবর পেল এরা হেমবাবুর বড়ছেলের মেহমান। গলায় গামছা বেঁধে ছিটকে ছুটে এল, ‘‘কর্তা, কর্তা, কী চাই বলো, কী তব বার্তা? জামাই বাবাজি বিয়ে করতে চলেছে? আমারও নিমন্ত্রণ আছে সেথায়। ওপরের ডেকে তোমাদের জন্য গার্ডেন চেয়ার পেতে দিচ্ছি। গঙ্গার হাওয়া খাও, ডেকে বিহার করো। গঙ্গাজল ফুটিয়ে চা তৈরি হচ্ছে, গুড় মিশিয়ে। খেলে চিত্তশুদ্ধি হবে।’’ সব ভালো যার চা ভালো। কিন্তু চায়ের বর্ণনা শুনে বজ্রাঘাত হলো যাত্রীদের কানে। স্টিমারের একতলা ফেটে পড়ছে ঘর্মাক্ত মানুষের ভিড়ে। স্টিমার ছেড়েছে, প্রভাত তপন আঁধারের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে দৃষ্টি শানাচ্ছে। জল নিয়ে লোফালুফি চলছে স্টিমারের চাকায়।

ক্রমে একটা স্তব্ধতা জমিয়ে আসছে সকলের মনে। টুকরো কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। গঙ্গার বাতাসে মহাপ্রাণী

খইস্যে আসছে। ইতিমধ্যে দেখা গেল গঙ্গাজল ফুটানো গুড়ের চা খেয়ে সকলে চরিতার্থ হয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বিহারের মুখোমুখি এসে সজল হয়েছে বাঙালির বাঁকা দৃষ্টি। ভাই, কতদিন যে গ্রামের হাটে তরী ভেরাইনি মনে পড়ে না। উফ, প্রাণটা হু হু করে। পেটে এত কথা ছিল আগে জানতাম না। আম, জাম, কাঁঠালের বাগান। মধু, মধু, মধু। পেটে তাল ঠুকছে। বুঝবি না! সে বড় ব্যথার দান। শুধু গাছের কুড়াবো, মাটির খাবো। বগল বাজাবো। অন্তিমে আমার যাওয়ার ইচ্ছা এক্কেবারে নাই। ''বুঝেছি কর্তা, বড্ড খিদে পেয়েছে। ওপারে ঘাটে গিয়ে পুরি খেয়ে ভুক্তভোগী হবেন। মিষ্টি পেঁড়া খেলে জীবনের দৃষ্টি পালটে যাবে,'' জানালো স্টিমারের সারেঙ।

এবারে পট পরিবর্তন। সকরীকলি ঘাট। বাংলার চেনা ভূমি ছেড়ে বিহারের অচিন মাটি। স্টিমারের দড়ি ধরে ডাঙার নির্ভরভূমিতে চরণ ফেলা যেন ট্র্যাপিজের মরণখেলা। শ্রীমতিরা টলমল করে জেটি পার হচ্ছেন। সামালো, সামালো।

সকরীকলি ঘাটে তিনটি গরুর গাড়ি অপেক্ষা করছে বরযাত্রীদের জন্য। হৃষ্টপুষ্ট বলদ, শরীরে রঙিন ঝালর

দেওয়া। গলায় ঘন্টার কংকনধ্বনি বাজছে। বর যাবে পাল্কি চেপে, গ্রামের অর্কেস্ট্রা বাজবে পেছনে। পাইক, বরকন্দাজ আছে। গ্রামের নগ্নগাত্র কালো ছেলেরা মাটির ধুলো উড়িয়ে পেছনে। বরকর্তা ব্যবস্থাপনাটা দেখে নিয়ে ঘোষণা করলেন, ‘‘নাও উই আর ইন দ্যা হার্টল্যান্ড অফ দ্য কাউ বেল্ট।’’ বরযাত্রীর দল ডাঙায় উঠে হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছে, কনের বাড়ি চড়াও হওয়ার আগে একটা খেলোয়াড়ি পরিকল্পনা। মেয়েদের দল জড়সড় অস্বস্তি বোধ করছে এই খোট্টাই দেশে। কপালে কত বিভ্রাট আছে, একটা অজানা আশঙ্কা বুকে।

বরকর্তা চতুর্দিক তদন্ত করে মেয়েদের গাড়িতে উঠে বসতে রায় দিলেন, ‘‘যা হওয়ার তা হবেই, বিলম্ব করে লাভ নেই।’’ সাবধানে গরুদের পাশ কাটিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেঁধিয়ে গেল মহিলারা গাড়ির টোপরের তলায়। সিঁধ কাটবার ভঙ্গীতে যত নিরাপদ দূরে যাওয়া যায়। গাড়ির শেষপ্রান্তে টঙে চড়ে বসেছেন বরের পিসি। ভারসাম্য রক্ষা করা গেল না। গাড়ি পেছন দিকে ডিগবাজি দিল। ফুটবলের মতো গড়াগড়িও দিল মাটিতে কয়েকজন মহিলা। পিসি আবার হাইকোর্টের জাঁদরেল

উকিল। গড়িয়ে যাওয়াটা যেমন তেমন নয়, পাশবালিশ, তাকিয়া কুড়িয়ে তোলার মতো। বড় মুখ করে বললেন, ‘যস্মিন দেশে যদাচার’।

যাত্রা এগিয়ে চলল। মুজবর গ্রাম, গোয়াগাচ্ছী গাঁও ছাড়িয়ে চলেছে চড়াই-উৎরাই বেয়ে। গাড়ি থামিয়ে গরুরা পাশের কুটিরের ঘাস-বিচালি মুখে টেনে নিচ্ছে। জমিদারীর খাসমহলে ঢোকার আগেই পাড়াপড়শির পাকা ধানে মই দিতে চায়।

হেমবাবুর দুটি সেপাই লাঠি ঠক ঠক করছে মাটির উপরে, হেঁটে চলেছে গাড়ির পাশে। হাতে তৈলাক্ত মোটা লাঠি, হাঁটুর ওপরে উঠেছে নতুন মোটা ধুতি, উর্ধাঙ্গে ধবধবে নতুন ফতুয়া। নিরুপদ্রব এই গাঁয়ের হাওয়ায় একটা অহেতুক হই হই রই রই না করলে হেমবাবুর প্রশান্ত মেজাজ অশান্ত হয়ে ওঠে। বরযাত্রীর দল গাড়ির টোপরের তলায়। পথে পথে বেলা বেলা বেড়ে গেল। কিষণপুর গ্রাম কাছে আসছে। বাঁশঝাড় বেড়ে চলেছে। গাড়ি একসময় রাস্তার বাঁক ঘুরতেই অদূরে ধরা দিল আমাদের লাল-সাদা দো’তলা প্রশস্ত বাড়ি।

গরুগুলো এবার গাড়ি টেনে লম্বা দৌড় দিল সেইদিকে। দোতলার বারান্দায় এতক্ষণে সারিবদ্ধ মাথা পথ চেয়ে আছে। বরযাত্রীরা এবার সতর্কে বিধ্বস্ত শরীরগুলো যথাসাধ্য মান-সম্মান বজায় রেখে নড়ে চড়ে গুছিয়ে বসেছে।

ছয়

এবার হাটের ধারে আমগাছগুলির তলায় এসে পড়া গেল। বড়কর্তার পোষা হাতি, হায়দার তার নাম, শিকল দিয়ে পায়ে বাঁধা আছে গাছের গুঁড়িতে। শুঁড়ের নি:শ্বাসের হাওয়ায় দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। আম গাছের গুঁড়ি তাকে বেঁধে রাখতে ঘাম ঝরাচ্ছে। আহা, অবোলা জীব। তবলা বাজায় হেমবাবুর প্রাণে। শেষবার হাতির পিঠে চড়াও হয়ে, পড়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে গেলেন। ভোল্টেজ কমে গিয়েছে সংসারে। শোয়ার ঘরে শুয়ে আজকাল গৃহি সন্ন্যাসী হয়ে পড়েছেন।

হাতি শহরের অতিথিদের আগমনের রাস্তায় শুঁড় আকাশে তুলে সেলাম জানাল। জামাইবাবাজি নাতির বয়স

বৈ তো নয়। পাশের ডোবা থেকে শুঁড়ে তুলে নিল পাঁকে ভরা জল, মশা আর মাছি। ছিটিয়ে দিল বরের পাল্কির গায়ে।

কাছারি ঘরে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। মা আমার বেয়ারা চেহারাকে ঘসামাজা করে যথাসাধ্য ভদ্রসমাজে উৎরে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বেহায়া স্বভাবের কানে আকুতির স্বরে ব্যাবহারের বিধিনিষেধ শুনিয়ে দিয়েছেন। বরযাত্রী এসে পড়ল বাড়ির সামনে। ‘‘বর এসেছে, বর এসেছে‘‘। যেন ডাকাত পড়ার আওয়াজ। শাঁখ বেজে উঠল। বড়মা, মেজমা, মা উলুধ্বনি করে উঠলেন। জিভের ডগায় কন্ঠের পর্দায় অমন তবলা লহরা আজকাল শোনা যায় না। আমি মায়ের সঙ্গে মিলিয়ে গলা ছাড়লাম। কিন্তু সেটা উলুধ্বনি তো নয়, ‘‘গেল গেল’’ রবে বেসুরো স্বরে কেলো করে দিল পরিবেশটা।

ঠাকুর্দা আজকাল ব্যথার শরীরে অন্দরমহলের যত্নের মলাট ছেড়ে আমজনতার কাছে ধরা দেন না। কিন্তু নাতজামাই আসছে, তাই আতর মেখে গতর সাজিয়েছেন। ঠোঁটে বঙ্কিম হাসি। দুই ধারে দুটি মানুষের কাঁধে হাত রেখে মহাত্মা গান্ধির মতো খ রের পোশাক চাপিয়ে কাছারি ঘরে

এসে দাঁড়ালেন। হাতে শক্তি ফুরিয়ে গেছে, শুধু আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দুই হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলেন। সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে। গ্রামের মানুষেরা বরযাত্রীদের ভুলে গিয়ে দিনমণিকে দীন চোখে দেখে নিচ্ছে অনন্তশয়ানের পূর্বে। দোষে গুণে মানুষ ছিলেন। কিন্তু চরিত্রে গল্পের মালমশলা ছিল তাই আজ দু:খ নেই। এই গল্প কেউ নাই বা পড়ুক। নাই বা হোক নাম, ধাম তো আছে। সরস্বতীর ঠিকানা তো পেয়েছি হেমবাবুর হেফাজতে।

বর পাল্কি থেকে নিজেকে উদ্ধার করে নেমে দাঁড়িয়েছে। দলে আছে এক রত্তি কিশোরী মেয়ে। সেই দিকে তাকাতেই আমার বয়সটা এক হাত বেড়ে গেল। জ্যাঠামশায় শুধান, ‘‘রাস্তায় আপনাদের কষ্ট হয়নি তো? এই অজ পাড়াগাঁয়ে আছেই বা কী, আমাদের আন্তরিকতাটা ছাড়া?’’

মনের দু:খ বুকে চেপে বরের পিসি উত্তর দিলেন, ‘‘সে কী কথা, এমন সোনার সংসার! আসলে আমরা শহরকুনো হয়ে পড়েছি। আপনাদের কাছে বাতের মলম আছে কি? রাতে যাতে কাত হয়ে না পড়ি। আহা ব্যস্ত হবেন না।’’ এবারে এ

বাড়ির বড় পিসি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন, ‘‘আপনাদের সকলের চাইতে আমি বয়সে বড়, আজকাল কোণঠাসা হয়ে পড়েছি। জমিদারির বাড়ন্ত বয়সে কী ছিল আর কী না ছিল পড়ন্ত বেলায় চিনবেন না। আমার বিয়ে এ বাড়িতে প্রথম। গাঁ উজার করে কাতারে কাতারে কাতারে মানুষ এসে উদর ভরে খেয়ে গেল। এই গাঁ সেই গাঁ, চারিদিকে প্রশংসায় ছিছিক্কার পড়ে গেছিল।’’ বড়পিসির বাংলা ব্যকরণে মাঝে মাঝেই প্রমাদে প্রমোদ হয়। জ্যাঠামশায় চোখ টিপে দিলেন। বড়পিসি শুধরে নিয়ে বললেন, ‘‘না না ভুল বলেছি, ঢি ঢি পড়ে গেছিল চতুর্দিকে। তা সে কথা ঘরে বসে পরে হবে।’’জামাইয়ের চিবুক টিপে বাঁদরছানার মতো আদর করে বললেন, ‘‘এমন দাঁতকপাটি ছেলে দেখা যায় না। না না ভুল বলেছি। চাঁদ কপালি ছেলে।’’

আহারেণ পরিচিয়তে। বরযাত্রীরা আসার পর থেকে দফায় দফায় মাছ ভাজা খেয়ে চলেছে। পেটের সঙ্গে রফা করে জামবাটিতে আয়েস করে পায়েস উদরে তলিয়ে নিচ্ছে। ঠাকুমা চিরকাল পেট পাতলা। সকলের খাওয়ার তদারকি করছেন।

“আহা, তোমাদের মুখগুলো শুকিয়ে গেছে। হ্যাঁগো, কিছু খাইলু?” সকলের পেটে তবলা ঠুকে চলেছেন।

এদিকে হাটের ধারে আমগাছের তলায় হায়দার এখন বড় একা। ঠাকুরদার সমবয়সী। কলকাতার অতিথিরা পেন্নামটুকুও ঠুকলনা কেউ। শুঁড়ের নি:শ্বাসে তীব্র বৈরাগ্যের ঝড় বেড়ে চলেছে। বরযাত্রীদের বড় কষ্ট আমাদের গ্রামের ছোট সংসারে। তাই ব্যবস্থা হয়েছে যাত্রার আসর। কলকাতা থেকে পার্টি ভাড়া করে আনা হয়েছে আগের দিন। কাছারির সামনে মাঠে বিরাট মঞ্চ। ঠাকুরদার কড়া নজর। যাত্রার স্ক্রিপ্টের ওপরে নিজের হাতে কলম চালিয়েছেন। আক্ষেপ করে ছেলেদের বলেছেন, “তোমরা দুর্গেশনন্দিনী, কিম্বা মহিষাসুর বধ পালা আনতে পারলে না?”

সাত

দুদিন আগে থেকেই দক্ষিণের মাঠে কাঁচা-পাকা বাঁশ ফেলা হয়েছে। আর কাঠের পাটাতন। দুদিনের স্বর্গ তৈরি হচ্ছে। আমি তন্ময় হয়ে দেখি। প্রশস্ত চারিদিক খোলা যাত্রার

স্টেজ চোখের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বাঁশ বেয়ে কত লোক উঠল আর নামল। ইস্কুলের তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে ওঠার ঘাম ঝরানো অঙ্ক - সমস্যা মনে আছে।আর্টিস্টদের জন্য মিডল স্কুলের কমনরুম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিড়ির গন্ধ। চায়ের জোগান দিয়ে হয়রাণ হয়ে গেল চাকরেরা। হারমোনিয়ামে বেপর্দায় বেপরোয়া পালা গানের ফোয়ারা ছুটে চলেছে। ওখানকার হাওয়া লাগাতে দু'দিনেই লায়েক হয়ে উঠেছি আমি। বাবা বললেন, "রিহার্সাল শুনে রাস্কেল হয়ে উঠেছ তুমি।" যাত্রা দলের কিশোর ছেলেরা, কেলেপানা ক্যাকলাস চেহারা, ধোঁয়া খাওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে আর্টের জাত বজায় রাখছে।

মাথায় একঝাঁক আদুরে চুল, চোখদুটি দিঘল। আজ রাতে সারা গ্রাম মশাল হাতে পথচারী। এ গাঁ, সে গাঁ। মনের চাপা আগুন যেন ফানুস তুলেছে আঁধার আকাশে। বিয়ের হাওয়াটাই এমন, পেটের খিদে, মনের খিদে, দেশলাইয়ের বারুদের মতো ফস করে জ্বালিয়ে দিল। কাছারির চওড়া বারান্দায় বাড়ির অন্দরমহল আসন পেতে থিয়েটার দেখবে।

সামনে বাঁশের সুক্ষ্ম চিকের পর্দা। বৌদের ঘোমটা সরে গেছে। বড়পিসি চোখের জল মুছে, কোমরে ভারী চাবির গোছা সামলিয়ে বললেন, ‘‘এ সবই তোর ঠাকুর্দার দান। চলে গেলে সলতেটা জ্বালিয়ে রাখিস বাবা।’’

দূরে সাঁওতাল গ্রামে মাদল বেজে উঠল। ড্রিম ড্রিম ড্রিম। আদিম সেই স্বর, সভ্যতার প্রথম প্রভাতের প্রারম্ভিক আলাপের ভাষা। সুঠাম যুবার দল, ওদের মেয়েদের কানে এমন সব ফুল আছে যা কলকাতার নিউ মার্কেটে পাওয়া যাবে না। ওরা আসছে মশাল জ্বেলে। মহুয়ার রসে টানটান হয়ে। গ্রামের মোড়ল ও কর্তাব্যক্তিরা কলকাতার অতিথিদের নিয়ে মাঠে একটা আলাদা সামিয়ানার তলায় সামিল হয়েছেন। মোড়লের গায়ে নতুন ফতুয়া, ভাগ্যিস লাল জুতুয়া ছিল না পায়ে। হাইস্কুলের মাস্টাররাও আছেন, অজ্ঞজন থেকে আলাদা আসনে সামিয়ানার তলায়। সাঁওতাল পাড়া এবার জুটে গেল স্টেজের ওপরে। সাঁওতাল নাচ শুরু হল। গ্রাম জীবনের ক্যালিপ্সো।

আট

এদিকে আজ বড়কর্তার চোখে ঘুম নেই। শীতের রাত, হিমের ছোঁয়া লেগে গায়ে জ্বর এসেছে। বিছানায় শুয়ে আত্মজীবনী ডিকটেশন দিচ্ছেন। আজ ডাক পড়েছে রাঙাপিসির। লিখে নেওয়ার পালা। ওনার সামনে বসার হুকুম ছিল না কারুরই। ঠাকুর্দার স্কুলে সকলেই দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থেকে দন্ড ভোগ করে। ডান পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, বাঁ পায়ে বিশ্রাম নাও। কৃতাঞ্জলি হয়ে ওনার মুখের কথা খাতায় টুকে নাও। কর্তার ঠোঁট বিড়বিড় করে ইতিহাসের বিনুনি পাকিয়ে চলেছে,

"১৯৪০ সালে মধু মিঞাঁকে বলেছিলাম তোর গাছের পেয়ারা ইতিহাসে অনেক দূর যাবে। বড় সখের সখা ছিল সে। মুজবর গ্রামে নদীর মুখে ওর বাড়ি। কই, সে পেয়ারা খাওয়ালো না তো? আমি পেয়ারা খাবো।" রাঙাপিসি বোকা হয়ে গেছে, "সে কী কথা, আজ উৎসবের বাড়িতে কত রান্না হয়েছে। তাছাড়া আপনার দাঁত পড়ে গেছে, পেয়ারা খাবেন কী করে? জ্বরটা বেড়েছে কি?" এমন সময় বাড়ির সামনের

দালানে দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকছে, ‘‘বাবুজি।’’ কিন্তু বাবুজি তো আজকাল বাড়ির বাইরে বেরোন না, দেখা হবে কী করে?

‘‘উনি আমাকে কাল রাতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, ‘মধু তোর গাছের পেয়ারা খাওয়ালি না, জানটা ধরে রেখেছি তোর জন্য।’ তাই আজ গামছা হাতে পেয়ারা ভরে এনেছি।’’

ঠাকুর্দার কানে পৌঁছে গেল সেই সন্দর্ভ। টলমল শরীরে মেয়ের হাত ধরে দালানে নেমে এলেন। ওনার আত্মবিশ্বাস প্রবল ছিল, তাই নিজেকে ভোলাতে পারতেন সহজেই। ‘‘কাল রাতে স্বপ্নে তোর কাছে গিয়েছিলাম।’’ এই বলে মধুকে জড়িয়ে ধরলেন।

নয়

আসর ছেড়ে বের হয়ে এলাম। বিয়েবাড়িতে আলাপ হওয়া নতুন এক বন্ধু আমার সঙ্গিনী। একতলা, দু’তলা, তিনতলার ছাদে এসে পড়লাম। এখানে আমার বোহেমিয়ান জীবনের কৈশোর কাটে। আকাশে উজজল তারাগুলো আতসবাজীর মতো ফেটে পড়তে চাইছে। আরেকটি নক্ষত্র, আরেকটি মৃৎপ্রদীপ আজ আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ছাদে দাঁড়িয়ে

আমাদের চোখের সামনে গোটা গ্রামটা একটা খোলা চিঠির মতো। ঐ সেই সন্ধ্যা, গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে আজ তবলার ত্রিতাল, ঝাঁপতাল বাজছে। স্বর্গদ্বারে বসে আমরা মর্তের বায়োস্কোপ দেখছি।

স্টেজে যাত্রা শুরু হলো। মুগ্ধ জনতার দৃষ্টি সেই দিকে। সামনের দিগন্ত আলোতে ভরে উঠেছে, পেছনে অয়রান অন্ধকার হয়রান হচ্ছে। কেউ জানে না আমগাছের তলায় হায়দরের শিকল এবার খুলে গেছে। অচলায়তন ভেঙে সচল হয়েছে সে। মেঘের মতো শরীরটা তার চলেছে নি:শব্দ পায়ে। এদিকে এগিয়ে এসেছে, কাকপক্ষীও টের পেল না। পায়ে তার বেড়ালের চলার সূক্ষ্মতা। জনতার পেছনে হায়দার দাঁড়িয়ে যাত্রা দেখছে নিথর হয়ে। অন্ধকারের শরীরে যেন এক গাঢ়তর ছায়া সে। যাত্রার জয়যাত্রা এগিয়ে চলেছে স্টেজে। অফুরান সেই আলোর ফোয়ারায় হায়দার যেন ফুরিয়ে গেছে। ওর ক্ষুদ্র চোখে আর মগজে কী চিন্তার প্রক্রিয়া চলছে কে জানে!

কে যেন ভিড়ের মধ্য থেকে সটকে বেরিয়ে এল সিঁধেল চোরের মত। অন্ধকারে বসে কষে এক ছিলিম গাঁজায় সুখের

টান দিতে। আজকের রাজকীয় সন্ধ্যায় তমোগুণী গাঁজার টানটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। ধাঁ করে মাটিতে বসে পড়েছে লোকটা। হেলান দিয়ে বসেছে সে হাতির পায়ে ঠেস দিয়ে। হায়দার কিছু বলল না। ভাবছে বোধহয়, দেখি বেয়াদবিটা কতদূর এগোয়! এবার আরেক সাগরেদ ভিড় থেকে খসে এল আঁধারের অন্তরালে।

"স্যাঙাত তুমি একাই টানবে বুঝি, আমাকে বঞ্চিত করবে? এক যাত্রায় পৃথক ফল তা কি হয়? তোর শরীরে সাক্ষাৎ শিবের লক্ষণ। আয় তোর পায়ে পেন্নাম ঠুকি।"

স্যাঙাত বসল মাটিতে হাতির পিঠে ঠেস দিয়ে। গঞ্জিকা সেবনে মনে মনে জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে দুজনে। পূর্ণিমার চাঁদ যেন গলা দিয়ে গলে নামছে। ওদিকে স্টেজে যাত্রার সংলাপ এগিয়ে চলেছে। রক্তিম তাল ঠুকছে জনতার ধমনীতে।

এবারে আমি আর সেই একরত্তি মেয়েটি ছুটে ছাদ থেকে নেমে এসেছি। ছোটাছুটি করে আমাদের তরুণ পা ক্লান্ত। এক দিনেই কত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে স্মৃতির কোটরে।

এবারে দুই গাঁজারু গান ধরেছে, ‘‘বলি, ও হরিরামের খুড়ো, মরবি রে মরবি রে বুড়ো। ভাটার টান ড্যাং, ড্যাং, ড্যাং, জলদি করো গাত্রত্থান।’’

দশ

হায়দারের এবার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। শুঁড় আকাশে তুলে আহত প্রাণের তীব্র প্রতিবাদ জানালো সে। গ্রামের আকাশটা যেন চৌচির হয়ে গেল। হায়দার আজ তার ভাগ্যের মাশুলকে শুঁড় তুলে নিয়েছে। মুহুর্তে গ্রামের জনতা স্টেজ ভেঙে, পর্দা ছিঁড়ে ছুটে পালিয়ে গেল। মুহুর্তে এত আলো, এত আয়োজন ফুৎকারে নিভে গেল। ক্ষুদ্র মানব মন, বৃদ্ধ হাতি। হায়দারের আর ঠাঁই নেই সেখানে। রইস আদমি আর নেই কেউ। ছুটে চলেছে সে, ময়রা পাড়া পার করে, ধোবা পট্টি, স্কুল, মেথর পল্লী ছাড়িয়ে। সংসারের দুয়ার ভেঙে আজ সে বিচ্ছিন্নতাকামী প্রাণী!

ঠাকুরদার শয়নকক্ষে আত্মজীবনী তখন যৌবনের পাতায় এসে পৌঁছেছে। হাতির পিঠে চেপে তখন সাহেব,

মেমসাহেবের সঙ্গে শিকারের সন্ধানে শোভা পাচ্ছেন। এমন সময় ঐ কার বৃহংণ ওনার উত্তরের জানলার বাইরে? উত্তরে খোলা প্রান্তর ভেঙে ছুটে চলল হাতি। ওই দিকে চারগুহা, ডাকাত চলার রাস্তা। হেমবাবু চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। হায় হায় করে তাঁর জরার্ত শরীরটা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল বুঝি পুত্র হারানোর শোক লেগেছে বুকে। একে একে ছেলেদের নাম ধরে ডেকে পাঠাচ্ছেন। হায়দারের মাহুত ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে, এক সিপাই পেছনে বসে। হাতির সন্ধানে ছুটে চলল তারা। হাতে শিকারীরা টর্চ অন্ধকারের বুক চিড়ে উধাও ঘোড়ার গতি। হিমেল হাওয়া চাবুকের মতো লাগছে গায়ে। বাবা উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনবার বন্দুকের আওয়াজ করলেন। এই আওয়াজ হায়দারের অচেনা নয়।

যদি শুনে ফিরে আসে পুরাতন অভ্যাসে? ওই দিকে দূরে ফুলহার নদী, তার ওপারে ডিল্লী দেওয়ান গঞ্জ। দ্বিতীয় ভিটে। হায়দারের গতি সেই দিকে। কিন্তু নদীর চর খুঁজে

নিরাপদে ওপারে পৌঁছতে পারবে কী? চরা বালিতে পড়ে গেলে কী হবে?

হেমবাবুর ফোকলা দাঁতে পেয়ারা খাওয়ার বাসনা অচরিতার্থ থেকে গেল। আজকের ঘটনা ওনার জীবন উপন্যাসের পরিকল্পনাতে ছিল না। ঠাকুরদার আত্মজীবনীর ভাষায় মালঞ্চে আজ ঝড়ের হাওয়া। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ শশী। বাতাসে ধুলো। কালিমাখা মেঘের ঘন ভ্রুকুটি অশনিসংকেত করছে। বাড়ীর লোকেরা ধমনীর তাল গুণে টিপ্ টিপ্ প্রহর গুনছে। আমি অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙে আবার ছুটে গেছি তেতলার ছাদে, হায়দারের পেছনে, দৃষ্টির তীর ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য। আমার ছায়াসঙ্গিনী হয়ে ছুটে গেছে সেই কিশোরী মেয়েটি। কনকনে বাতাস আর অশান্ত মেজাজ, দুইয়ে মিলে দাঁত কপাটি লাগার জোগাড় জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘তোমার ভয় করছে?’’ সে শুধু বোবা ধরার স্বরে উত্তর দিল, বু-উ-উ। পশ্চিমের হাওয়াকে দেহাতে বলে পহিয়া। সারাদিন অন্দরের অবগুন্ঠনকে কানে কানে সাধন দেয়, ‘‘পালাও পালাও’’। ভাঙা হাটে শমন জানায়।

আজ রাতে বিবাহ বাসর কানায় কানায় চোখের জলে ভরে উঠেছে। বড়পিসি ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে পাথর হয়ে বসে রইলেন।--- কী আছে ঐ উন্মুক্ত বোবা উত্তর প্রান্তরে? ধনমনিয়া, চারগুহা, কামাথ, কন্‌খর নদী, জঙ্গল মহল। সেই জঙ্গলে চিতাবাঘ, বুনোশুয়োর, নীলগাই, বিষাক্ত সাপ। দেড়গুণ সাইজের বুনো মোষ সমস্ত জীব জগতের শরীরে শিং ঠুকে চলেছে। নদীতে কুমির ঘাই দেয়। জঙ্গল মহলে হায়দারের পিঠে চেপে হেমবাবু সাহেব, বিবি, গোলামদের সঙ্গী করে শিকার করেছেন যৌবনে। সঙ্গী ছিল জজ সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও। ইংরেজ আমলে নীলকুঠি ছিল। অসময়ে মেঘের গর্জন কেন? স্বপ্নের বলাকা উড়ে গেল দু:স্বপ্নের কালো রাতে।

এগারো

কিন্তু হেমবাবু জখম হয়েছেন বটে, খতম হন নি। ওনার প্রকৃতিস্থ হতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। এসে বসেছেন বারান্দার আরাম কেদারায়। এক কালে এর চাইতেও বড় সংকট, উৎকট বিপদ পার হওয়া গিয়েছে। ফিরে এসেছে

অভিজ্ঞতার হাতে পেটানো শক্ত ব্যক্তিত্ব। লন্ঠনের আলো-আঁধারে ওনার মুখটা কঠিন দেখাচ্ছে, যেন মেঘের পাহাড় জমেছে। কলকাতার অতিথিরা এতসব অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেনি।

ওনার সাবেক মেজাজটা এবার সবাক হয়ে উঠল। ডাকো লেঠেল আর সেপাই সর্দারদের। অনেকদিনের অব্যবহারে যাদের আজ মরচে পড়েছে শরীরে। বর্তমানের মলাটের তলায় লুকিয়ে ছিল জমিদারি বাঘ নখ। ওরা এসে দাঁড়িয়েছে দালানে। হেমবাবু অতীতের গায়ে হাতড়াচ্ছেন--সংসার-সীমান্তে কতটুকু শক্তি বজায় আছে? বর্শা আর লাঠি। ঘরের লক্ষ্মী। এরা এ বাড়ির নিমক খেয়েছে বংশানুক্রমে। লড়েছে, আর গড়েছে সংসারটাকে। আত্মজীবনীর সশস্ত্র চেহারাটা এবার ডায়েরির পাতা থেকে উঠে এসেছে। সেপাই সর্দার সামনে এসে দাঁড়াল। বিনীত প্রণাম।

ঠাকুর্দা বললেন, ‘‘হায়দার চলে গেল। গৃহলক্ষ্মী তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। ও স্বভাব চঞ্চল। ওর মাথায় গজমতি আছে। মুখে গজদন্ত। অনেকেরই লোভ আছে ওর

ওপর। মত্ত হাতি মানুষ মারতে পারে। আমার এক দায়িত্ব আছে আশেপাশের গ্রামের ওপর। সে আর ফিরবে কিনা জানিনা। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো, সেই শক্তি আমার নেই। ওকে খুঁজে বেড়াও। যেখানে থাক, যতদূরেই থাক। ফেরাতে না পারো, চোখের আড়াল করা চলবে না। লেঠেল সর্দারকে ডাকো।''

লাঠিয়াল এগিয়ে এসে লাঠি মাটিতে শুইয়ে রেখে প্রণাম করল। ''ভেবেছিলাম তোদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। তোরা আমার দুর্দিনের দামাল বন্ধু। আমার ওই অবোধ ছেলেকে ফিরিয়ে আন। যে আমার হায়দারের খবর প্রথম দেবে তাকে দু বিঘে জমি দেবো।'' এই দেওয়ার অর্থ দেনাপাওনার অভিধানে পাওয়া যাবে না। ওরা জানে কত মরমী এই দান। উনি সকলের দিকে তাকিয়ে শেষবার অদ্ভূত চড়া গলায় বললেন, ''যাও।'' আমার কানে সেটা শোনালো যেন মার্শাল কল--''শুট্।'' জমিদারির দামাল রথ কৃষ্ণপক্ষের রাতে মশাল জালিয়ে, পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, গ্রামের গলিতে, চষা মাঠে, উধাও দিগন্তে ছড়িয়ে গিয়ে জাল পাতল। ঠাকুরদার

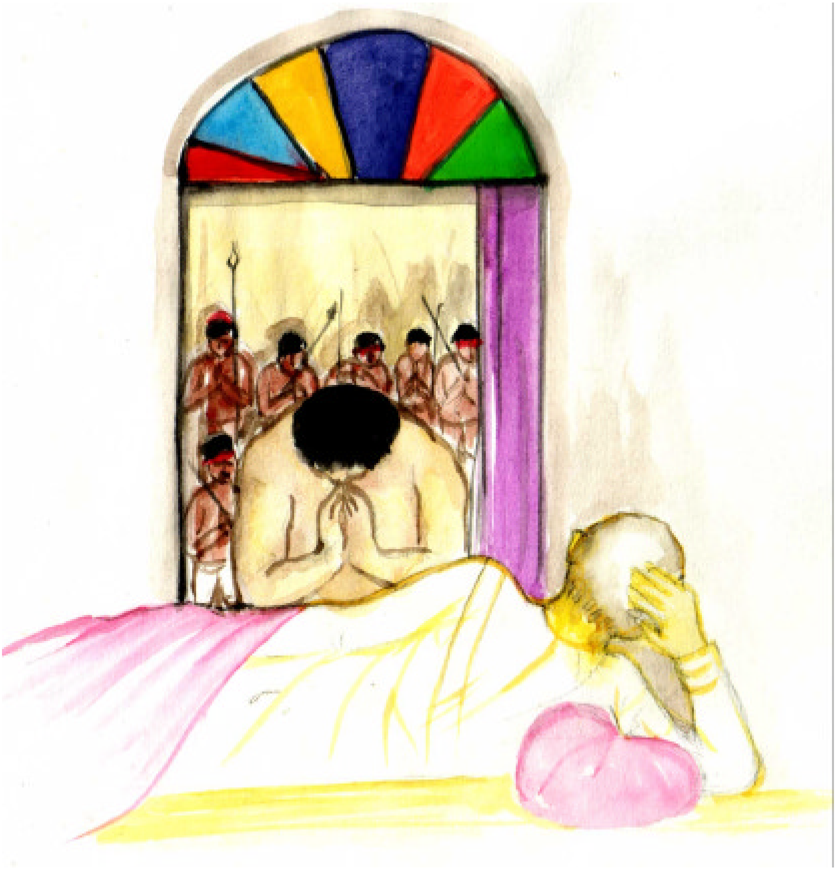

আত্মজীবনীর ডিকটেশান এবার বন্ধ। ওনার শোয়ার ঘরের মেঝেতে বসে রাঙাপিসি লন্ঠনের আলোতে কী লিখছেন? টুকসি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘‘ পিসি তুমি কী লিখছ?’’

‘‘আজকের দিনটা। এই যা দেখলে, শুনলে, সব লিখে রাখছি। তোমার নামটাও টুকে রাখলাম খাতায়। টিঁকে থাকবে অনেকদিন। সেই ডায়েরি। রাঙাপিসি খাতা ও সুন্দর এক কলম তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘বাবা তোমার জীবনী লেখ।’’ ছোট মেয়ের অনুরোধ ঠেলতে পারেন নি। শক্ত মানুষ ছিলেন, তাই নরম জমিতে লড়াই করতে পারতেন না। বাড়ির মেয়েদের কাছে আত্মসমর্পণ। নিজের মেয়েদের দিকে একটু বেশি টান। ছেলেদের , বউদের সম্মান ও মর্যাদার ওপরে কড়া নজর। কেবল নাতিরা ছিল বুড়োর ব্লাইন্ড স্পট। ঠাকুরদা রাতকানা আর নাতিকানা। আজ সন্ধ্যায় আবার সংসারের হাল ধরেছেন।

বারো

উৎসবের বাড়ি আবার হাঁকডাক করে উঠল। ঠাকুরদার চোখে কিছুই নজর এড়িয়ে যায় না। ‘‘নাতিগুলো

কেন প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পরে না? আমরা বাপের জন্মে কেউ ধুতি ছাড়িনি।"

বাবা আমার হাত ধরে দোতলায় নিয়ে গেলেন।

"নাও, ধুতি পরো।"

"না। আমার লজ্জা করে। ওটা খুলে যায়।"

"তবে কি তুমি হাফ প্যান্ট পরে হাফ নেকেড ফকির হয়ে বিয়েবাড়িতে ফ্যা ফ্যা করে বেড়াবে?"

আমি হাত ছাড়িয়ে সটান দৌড় দিলাম। বাল্যের স্বাধীনতা বাহুবলে নয়, দৌড়েই রক্ষা করা যায়। ছিটকে গেলাম দক্ষিণের বারান্দায়। বাবা ইংরেজ গোরা সৈন্যের মতো ধাওয়া করলেন। ঘরে দেওয়ালে ঝোলানো ছিল ঘোড়ার চাবুক। হাতে তুলে নিয়ে হাওয়ায় সপাং সপাং চালাচ্ছেন। আজ যেন হায়দারের বিরহে গায়ের জ্বালা আমার পিঠে জুড়োতে চান। আমি ছুটে গেলাম উত্তর , দক্ষিণ ও পূর্ব বারান্দা দিয়ে। এমন সময় মেজ জেঠিমা মাঝখানে এসে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তাল কেটে দিলেন। আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন, "ঠাকুরপো, তুমি কোনদিন কারো গায়ে হাত

তোলো নি। তুমি অজাতশত্রু। কিন্তু আজ তুমি কেন স্বধর্মে বিধর্মী হবে?’’

বাবা এবার সত্যিই লজজিত। ইতিমধ্যে আমার ছায়াসঙ্গিনী গুটি গুটি সেখানে পৌঁছে গেছে। জিজ্ঞাসা করল, ‘‘তোমার ভয় করছে?’’ আমার বোবা ধরা স্বরে উত্তর এলো, ‘‘বু-উ-উ’’। ঘরের মধ্যে এক বিশাল বল্লম দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। জমিদারির এই নরমে গরমে সংসারের মেজাজ চোরাবালির মত ভয়ংকর ঠেকছে তার।

আজ রাতে বিয়েবাড়ির খ্যাঁটটা ভালোই জমল। ছোট পিসেমশাইয়ের খাওয়া শুরুতে স্লো, তারপর ভোঁ দৌড় দিয়ে ভাঁড়ারকে শশব্যস্ত করে তোলে। প্রথমে খাবারের আসনে বসিব কি বসিব না, দ্বিধাজড়িত পায়ে মন্দগতিতে ফন্দি আঁটেন, ‘‘আমি দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছি এই অল্প আহারে।গণ্ডাচারেক লুচি দিও। চপকাটলেট দু’চারখানা। ফিশ কাটলেট ফাউ দিও। ডিমের ডেভিল ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। ওনলি রিগ্রেট রান্নার মেনুটা ছাপা হল না।

আজকের ক্ষুধা যেন একটু বাড়াবাড়ি রকমের। খেতে বসে মাংসের সাথে মাত্রাতিরিক্ত আহ্লাদ করে চলেছেন। একটা প্রকাণ্ড সাইজের হাড় দাঁতে চিবোতে গিয়ে কায়দা করতে পারছেন না। হার মানা হাড় পরাবো তোমার গলে। ওনার সামনের সারিতে বসে বরকর্তা দৃষ্টি ফেরাতে পারছেন না। ভ্রু যুগল জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আজ রাতে হাওয়াটাই খাওয়ার। জামাইয়ের পাতে প্রকাণ্ড সাইজের মাছের মুড়ো। ‘‘কাতর হয়োনা ভাই,’’ শ্যালিরা বলছে, ‘‘দেখি তুমি কেমন বাঘের বাচ্চা। একদিন সংসারের মাথা হবে তুমি। সংসারের সকলের মস্তিষ্ক চর্বণ করবে সেদিন । দ্যাখো আমাদের ঠাকুর্দাকে। পাঠশালার দ্বিতীয় শ্রেণী পার করতে পারলেন না। ক্ষীণজীবি শরীরে অসার ঘিলুর এক অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। ওনার বাবা অর্থাৎ কর্তাদাদু, তাঁর হাবা ছেলের জন্য চার বেলা মাছের মুড়ো বিধান করলেন। লেখা আছে ডায়েরির পাতায়। তাই এত বছর পার করে দিয়েও ঠাকুরদার শিয়রে টাক পড়ল না। নাতিরা পাকা চুল তুলতে গিয়ে হতাশ হল। স্মৃতিশক্তির গায়ে

জরা ধরল না এতটুকু। আজ তিনি রাঘব বোয়াল। সংসারের টুকিটাকি হিসেব ধরে রেখেছেন চুম্বকের মতো।”

তেরো

উৎসবের বাড়িতে খাওয়া যখন হাওয়া কাঁপিয়ে চলেছে সংসারটা লুকিয়ে চোখের জলও ফেলছে যতক্ষণ, ততক্ষণে হায়দার পৌঁছে গেল মাঝরাস্তায় কামাথের ফসলের গোলায়। খাবার উদরস্থ করল অনেকটা, ছড়ালো বেশি। এটা তার দীর্ঘ পদযাত্রার প্রথম চরণ বা বেস ক্যামপ। তাই রসদ নিতে হবে পর্যাপ্তভাবে। হেমবাবুর পেয়ারের হাতি শেষবার নিমক খেল তাঁর। বড়কর্তা সেদিন মুখে অন্ন তুললেন না। হায়দারের মাহুত মৌলা বক্স ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তুলে সেদিকে ছুটে আসছে। হায়দার সরে দাঁড়াল এক বিশাল ঝোপের আড়ালে। পায়ের তলায় একটা ডাল ভাঙার আওয়াজও হলো না। মৌলা বক্স ঘোড়া ছুটিয়ে দূরে চলে গেল অন্ধকারের গায়ে হাতড়িয়ে পলাতক পথিকের সন্ধানে। দূরে নেকড়ের ডাক শোনা যাচ্ছে। অরণ্যের আহ্বান। হায়দারের

জীর্ণ বয়সে আজ পিঞ্জর ভাঙবার শক্তি ফিরে এলো। এলোমেলো চিন্তার ধারা মাথা তুলে আকাশে এক তারা খসে পড়ার যাত্রাপথ লক্ষ্য করছে। আলোর মালা উত্তর আকাশে রেখা টানলো। ডিল্লী দেওয়ানগঞ্জের গন্তব্যস্থল ছেড়ে ফুলহার নদীর এপার ধরে এগিয়ে চলল সে। জঙ্গলমহল শত প্রাণীর গলায় তাকে ডাক দিচ্ছে। ফুলহার নদী আর কনখরের জলধারা মহানন্দার সঙ্গমে গিয়ে পড়বে। আরও দূরে সে পথ আঙুল দেখাচ্ছে --পুর্ণিয়া ছাড়িয়ে অয়রাণ অরণ্য। বিভুতিভূষণের ‘আরণ্যক’ গল্পের লবটুলিয়া বইহার। অরণ্যের বাণী জঙ্গলের প্রাণীকে আদিম স্বভাবের ডাক দিয়েছে সেদিন। কিষণপুর পরে রইল বহুদূর পিছনে, ইতিহাসের পাতায়, ডায়েরির খাতায়। দিন গেল, মাস অতীত হল। হায়দার ততদিনে হয়তো তরাই অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। ভুটানে যার জন্ম হয়েছিলো, বিহার তাকে আমৃত্যু ধরে রাখতে পারলো না। হায়দার চলে গেল। কেটে গেল তার সঙ্গে গ্রামের এক যুগ। আর, একই সঙ্গে এলো জমিদারি বিলোপ আইন।

হেমবাবুর গল্প হয়তো এখানেই শেষ হতে পারতো, কিন্তু বাদ সাধল আমার ছেলে। ওর শরীরে হয়তো নীল রক্ত ফিকে হয়েও অবশিষ্ট আছে।

“বাবা, আমায় কিষণপুর নিয়ে চলো। ঠাকুমার পালংক তুলে নিয়ে আসবো,” চয়ন বললো।

বহু বছর পরে ওর সঙ্গে ফিরে গেলাম পরিত্যক্ত ভদ্রাসনে। ভাঙা বাসার সবটাই সে তন্ন তন্ন করে খুঁজে চললো আমার গল্পের রত্ন সন্ধানে। সঙ্গে ওর জেঠুও আছেন। গ্রামের আঁধার আকাশের তলায় বসে স্মৃতির ঝুলি হাতড়ে চলেছেন। বয়সের যত স্মৃতি, কনিষ্ঠের ততশত কৌতুহল। চয়ন খুঁজেপেতে জোগাড় করলো কুমির আর লেপার্ডের চামড়ার টুকরো। হেমবাবু হায়দারের পিঠে চেপে শিকার করেছিলেন। জোগাড় হল ওনার লাইব্রেরি থেকে অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকা চারশো বছরের পুরোন তালপাতার বিভিন্ন পুঁথি।

গ্রামের কোল ঘেঁষে উঁচু পিচের রাস্তা ছিল একসময় রেলস্টেশন ধরবার জন্য। সেই রাস্তা আজ গঙ্গার খিদে মেটাচ্ছে। পাশের গ্রামটাও নদীর ভাঙনের হাত ধরে

ইতিহাসের পাতায় ছুটি নিয়েছে। ছেলেকে নিয়ে গেলাম সেখানে, নিয়তি যেখানে গ্রামের রাস্তাকে ঝুঁটি ধরে গঙ্গায় চোবাচ্ছে। ল্যান্ড'স্ এন্ড। ভাঙনের খাদের সামনে আমরা দুটি প্রাণী। অনেক নিচে গঙ্গার জল স্রোত পাকাচ্ছে অশিষ্ট ক্রোধে। পেছনে আদিম কালের পছিয়া হাওয়া কানে কানে সাধন দিচ্ছে, ''পালাও, পালাও''। চয়ন ক্যামেরা তুলে ধরেছে চোখের সামনে। সামনে তার এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। খালি গায়ে পইতে, পরিচ্ছন্ন ধুতি। অশিতীপর, কিন্তু টানটান বুক। চোখের চশমা ঘোলাটে হয়ে গেছে, তার একটা কাচ ফাটা। ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে বিহারের মানুষের এক প্রান্তিক ছবি।

ফটো তোলা শেষ হলো। এবার সেই বৃদ্ধ সজল গলায় হিন্দিতে বললেন, ''আমি নগেন্দ্র চৌধুরি। এই গাঁয়ে আমাদের অনেক পুরুষের বাস। হেমবাবুর পরিবারকে আমি চিনি। যেখানে দাঁড়িয়ে আজ ফটো তুললেন, সেখানে দাঁড়িয়ে আপনার ঠাকুর্দার বাবার সৎকার আমি দেখেছিলাম।

সেই আয়নার ঠোঁটে সেয়ানা হাসি, চোখে জল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আজকাল নানান মুখভঙ্গী করে ছেলে দাড়ি

কামায়। মেয়েটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরেফিরে নিজেকে দেখার আশ মেটাতে পারে না।

আজ আমার ছুটি। ভাঁটার টান, ড্যাং, ড্যাং, ড্যাং, জলদি করো গাত্রোত্থান।

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতিঃ

শ্রী সুজয় রায় পেশায় একদা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃজনশীলতাকে ধরে রেখেছেন চিত্রশিল্পী হিসেবে। সৃষ্টিশীল মানুষটি মাঝেমাঝে তুলি-ক্যানভাস-রঙ-এর বদলে কাগজ-কলম-বর্ণমালাকেও অবলম্বন করে এঁকেছেন অনুপম সব শব্দছবি। সেই আয়না তারই একটি উদাহরণ।

যোগাযোগ: sujoyroy1@gmail.com